



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 59 - 70

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 – 0848

জাদুবাস্তবতার ‘রূপান্তর’ (Metamorphosis) পদ্ধতি :

প্রসঙ্গ মনসামঙ্গল কাব্য

তাপস মণ্ডল

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

দেওয়ান আব্দুল গনি কলেজ

ও

গবেষক, বাংলা বিভাগ, বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়

Email ID: mondalt247@gmail.com



Received Date 20. 01. 2026

Selection Date 10. 02. 2026

Keyword

*Magical Realism,
Marvelous
Realism, manasa,
Chand Sadagar,
Behula,
manasamangal
kavya,
Transformation,
Metamorphosis.*

Abstract

Magic realism is one of the most widely praised and discussed narrative techniques in modern literary discourse. It is not a literary movement, but a literary style. The question of how ‘Magic’ and ‘Realism’ two contradictory elements coexist within the same frame makes us ponder. ‘Magic’ and ‘Realism’ both have different foundations; when placed side-by-side, these two subjects are never the same, nor are they supposed to be. However, the harmonious blend of the two opposite poles of ‘Magic’ and ‘Realism’ is noticeable in the term ‘Magic Realism’. After the term ‘Magic Realism’ used by Franz Roh in 1925, was applied to painting, complexity arose among ‘Magic Realism,’ ‘Magical Realism,’ and ‘Marvelous Realism’. However, ‘Magic Realism’ reached the global audience by following the stream of magic realism prevalent in Latin America. Among the various elements of magic realism, the most notable element or characteristic is the ‘transformation’ method or ‘metamorphosis’. Through transformation, the boundaries between reality and imagination, or reality and the surreal, are erased. While magical realism was popularized and spread by foreign influence, the abundant application of the transformation method can be observed much earlier in the Bengali Manasamangal kavya of the middle Ages.

Discussion

রূপান্তর জাদুবাস্তবতার সাহিত্যে ‘রূপান্তর’ (Metamorphosis) বা ‘Transformatin’ হল একটি সাধারণ ঘটনা। রূপান্তর হল কোনো চরিত্রের রূপের বা অবস্থানের যে কোনো স্পষ্ট ও তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন। এটি বাস্তবতা ও অতিপ্রাকৃতের অন্তর্ভুক্তি রেখা। রূপান্তরের বর্ণনা পাঠককে বাস্তব ও অতিপ্রাকৃতের মধ্যবর্তী পরিবর্তনশীল অনিশ্চিত ও অন্তর্ভুক্তি স্তরে নিয়ে

যায়। এটি এমন এক বর্ণনা ভঙ্গি যা বাস্তবকে অবাস্তবের পাশাপাশি স্থাপন করে এবং অদ্ভুত অলৌকিক ঘটনাগুলোকে স্বাভাবিক বিষয় বলে মনে হয়। রূপান্তরের মাধ্যমে বাস্তবতা ও কল্পনা কিংবা বাস্তব ও পরাবাস্তবের মধ্যকার সীমা অতিক্রম করা হয়। মেটামরফোসিস বা রূপান্তর কখনো শারীরিক, কখনো মানসিক আবার কখনো নৈতিক চেতনার প্রতীক হিসেবে কাজ করে। রূপান্তরের সুন্দর দৃষ্টান্ত আছে কাফকার 'Metamorphosis' এবং সলমন রুশদির 'Midnight's Children' উপন্যাসে। কাফকার রূপান্তর গল্পে দেখা যায় যুবক গ্রেগর সামসা এক ভ্রাম্যমাণ সেলসম্যান। বৃদ্ধ মা বাবা আর বোনের দায়িত্ব তার কাঁধে। নানা দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনা, আনন্দহীন ক্লাস্তিকর কাজের বোঝা, চাকরি ক্ষেত্রে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের ঔদাসীন্য প্রভৃতিতে সে বিপর্যস্ত। গল্পের শুরু হয় এক অদ্ভুত অলৌকিক বর্ণনা দিয়ে। গ্রেগর সামসা একদিন বিভিন্ন দুঃস্বপ্ন দেখার পর ভোরবেলা যখন সে ঘুম থেকে জেগে উঠলো, দেখল সে একটা বিশাল পতঙ্গ পরিণত হয়েছে। প্রথমে গ্রেগর ভেবেছিল যে এটা বোধহয় তার ঘুমের মধ্যে দেখা বিভিন্ন দুঃস্বপ্নেরই একটা সম্প্রসারিত অংশ, কিন্তু না, এ কোন স্বপ্ন নয়। সত্যিই সে একটা বিরাট আরশোলায় রূপান্তরিত হয়ে গেছে। এই স্তরে গল্পটি অবিশ্বাস্য, অবাস্তব। কোনো মানুষ বাস্তব অর্থে আরশোলায় রূপান্তরিত হতে পারে না। সেদিক থেকে আমাদের মনে হতে পারে 'Metamorphosis' বাস্তববিরোধী গল্প। কিন্তু এই গল্পে আক্ষরিক বাস্তবতাকে অতিক্রম করলে আমরা দেখব বিচিত্র ও ভয়ঙ্কর অর্থ।

গ্রেগর অনিচ্ছা সত্ত্বেও পরিবারের সুখ-স্বাস্থ্যের জন্য চাকরি করেন। ধনতান্ত্রিক সমাজে চাকরিজীবন যে কত দুর্বিষহ, পারিবারিক জীবন কত যে অন্তরবিযুক্ত এবং জীবনের রসকে কিভাবে নিংড়ে আখের ছিবড়েতে পরিণত করে দেয়, তা জানতে, বুঝতে পারি গ্রেগরের অনুভবের ভিতর দিয়ে। ফার্মের মালিক ও ম্যানেজারের কাছে গ্রেগর মানুষ নয়। গ্রেগর সেখানে ব্যবসা ও মুনাফা বৃদ্ধির জন্য এক মূল্যবান যন্ত্র। তিনি মনে মনে প্রতিবাদ করেন কিন্তু সেই প্রতিবাদ বিলীন হয়ে যায় দায়িত্ববোধের কাছে। গ্রেগর স্বাধীন ইচ্ছে শক্তির বিরুদ্ধে এই পরিবেশের কাছে নতজানু হতে হয়। গ্রেগরের পোকায় পরিণত হওয়ার একটি দিক রয়েছে। গ্রেগর যখন মোটা বেতনের চাকরি করত এবং সে যখন পোকায় পরিণত হয়ে পরিবারের বোঝা হল - উভয় সময়ের সম্পর্ক অভিন্ন। সে উপলব্ধি করেছিল, জীবনের বুনয়াদ অর্থ যোগান দিতে না পারলে পরিবারের ভালোবাসা হয়ে ওঠে অস্বস্তিকর, নির্দয়যন্ত্র বিশেষ। সে এখন নিজের বাড়িতে আপন জনের কাছে অবাস্তিত কীট। রুশদির 'Midnight's children' উপন্যাসেও আমরা রূপান্তরের সুন্দর দৃষ্টান্ত দেখি। আদম আজিজ যখন নামাজ পড়ার চেষ্টা করে, তখন তার নাক বরফে শক্ত হয়ে যাওয়া মাটির ঢিবিতে ধাক্কা খায়। ফলে -

“three drops of blood plopped out of him left nostril, hardened instantly in the brittle air and lay before his eyes on the prayer mat, transformed into rubies.”^১

আদম আজিজ তার মায়ের সাথে কথোপকথন করার সময় দেখতে পায় তার মা “Turned into a Lizard on the wall of the corridor and her tongue out at him.”^২ রূপান্তরের এই দৃষ্টান্তগুলি এতটাই পদ্ধতিগত এবং বিশ্বাসযোগ্য ভাবে ঘটে যে সেগুলিকে স্বাভাবিক বলেই মনে হয়। এ কারণেই ওয়েন্ডি ফ্যারিস উল্লেখ করেছিলেন যে জাদু বাস্তবতার সাহিত্যে “Metamorphosis are a Relatively common event.”^৩

রূপান্তরের এমন ব্যবহার মনসামঙ্গল কাব্যের প্রতিটি পাতায় পাতায় পাওয়া যায়। কাব্যে স্বপ্ন, মিথ, প্রতীক প্রভৃতি জাদুবাস্তবতাকে মন্দ্রিক উপাদানগুলি রূপান্তরকে সহজ অথচ গভীর তাৎপর্যমণ্ডিতভাবে প্রকাশ করে। মনসামঙ্গল কাব্যের সবচেয়ে বেশি রূপান্তরের পরিচয় পাওয়া যায় মনসা চরিত্রের মধ্যে, শিব, দুর্গা, বেহলা চরিত্রের মধ্যেও রূপান্তর লক্ষণীয়। সমগ্র মনসামঙ্গল কাব্য জুড়ে মনসা চরিত্রে ভিন্ন সময়ে ভিন্ন পরিস্থিতিতে নানা ধরনের রূপান্তরের দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করা যায়। মনসা মর্ত্যে ক্ষমতা বিস্তারের জন্য সমাজের নিচু স্তর থেকে প্রভাব বিস্তার শুরু করেছিল। মনসামঙ্গল কাব্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল- মনসার রাখাল বালকদের দিয়ে নিজের পূজা প্রচার করা। এই উদ্দেশ্য পূরণে সে ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করে রাখাল বালকদের কাছে উপস্থিত হয়। অতিরিক্ত কোন কিছুই নয়, শিশুর জন্য সামান্য দুধ চেয়ে রাখাল বালকদের কাছে অপমানিত লাঞ্চিত হয়েছে মনসা। মনসা যেন সমাজ ব্যবস্থার অনুসন্ধানীর ভূমিকা পালন করে, যেখানে সে দেখতে পায় মানুষের অনাচার, অমানবিকতা ও হৃদয়হীনতার ছবি। সমাজের এহেন ছবিকে বদলাতে নিজেই হয়ে উঠেছেন বহুমাত্রিক সত্তার রূপান্তর। রাখাল বালকরা মনসার স্বীয় ক্ষমতা উপলব্ধি করতে না পেরে তাকে অপমান করে।

মনসা প্রতিশোধ নিতে তাঁদের সমস্ত গুরু চুরি করে লুকিয়ে রাখে এবং তিনি নিজেকে বৃদ্ধা রূপে রূপান্তরিত করে রাখাল বালকদের সামনে উপস্থিত হন -

“ক্রোধ হৈয়া বিষহরি চলিল ফিরিয়া।
 রাখালের যত গরু রাখিল লুকায়া।।
 কান্দে সব রাখালিয়া হারাইয়া বাছা গাই।
 কি বুলিয়া উত্তরিব বাপমায়ের ঠাই।।
 এক নহে দুই নহে হারাইলু পাল।
 বিধি বিড়ম্বিল ভাই হৈলাঙ কাঙ্গাল।।
 কান্দে যত রাখাল করিয়া হয় হয়।
 বৃদ্ধরূপে পদ্মাবতী সেই দিগে যায়।।”^৪

মনসার বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর যে রূপ, সে বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ। কবির বিবরণে মনসার রূপান্তর হলো এভাবে-

“শুনিঞা সখীর বোল ভুজগ জননী। নিজ রূপ ত্যজি হৈল বৃদ্ধ ব্রাহ্মণী।।
 গলে গজমতি হার তাহা কৈল দূর। হাথের কঙ্কণ তাড় পায়ের নূপুর।।
 হেম সুললিকা দোলে নাসা শ্রুতিদেশে। সকল করিল ত্যাগ, সজ্জ বৃদ্ধবেশে।।
 পাণ্ডুর আকৃতি হৈল মাথার কুন্তল। তনু জরজর বড় হৈল ক্ষীণবল।।
 শুন নেত তেজিয়া মুকুল কলেবরে। মায়া হেতু ছিঁড়া কানি বিষহরি পড়ে।।
 দশন পতিত হৈল অঙ্গে লোলে মাস। চলিতে চলিয়া পড়ে ঘন বহে শ্বাস।।
 বাম হাথে লোহাগাছি ডান হাটে আসা। রঙ্গন চুপড়ি কক্ষে চলিল মনসা।।
 মায়া করি চলে দেবী ভুজগ জননী। নিমিষেকে চলে বুড়ী বৈসে খানি খানি।।”^৫

মনসার এই রূপান্তর শুধুমাত্র ভৌতিক বা বাহ্যিক রূপান্তরের নয়, বরং অন্তর্মুখী আত্মগোপন, কৌশলী, পরিকল্পনা এবং সমাজের গ্রহণযোগ্যতা অর্জনের এক গভীরতম বহিঃপ্রকাশ। দেবী মনসা যুবতী, শক্তির আধার- ইচ্ছাকৃত ভাবে নিজেকে বৃদ্ধা রূপে রূপান্তরিত করেছেন। এটি এমন এক রূপান্তর, যা স্বকীয়তা আড়াল করে সমাজে মিশে যাওয়ার কৌশল। সহজ, সরল, সাধারণ রাখাল বালকদের কাছে দেবী মনসা শক্তিস্বরূপা হিসেবে নয়; তাদেরই মত সহজ সরল নিরীহ বৃদ্ধার মত আত্মপ্রকাশ করেছে। সাধারণের কাছে সাধারণ হয়েই নিজের অসাধারণ গুণের জয়গান গেয়ে নিজের উদ্দেশ্য পূরণে অগ্রসর হয়েছে। বৃদ্ধা হিসাবে মনসা সমাজে অভিজ্ঞতা, সহনশীলতা ও মমত্ববোধের পথিক হয়ে ওঠেন। একটিতে সহনশীলতা ও মমত্ববোধ, অন্যদিকে শক্তির আধার - এই দুইয়ের মেলবন্ধনে মনসার এই রূপান্তর লেখকের বর্ণনা গুণে বাস্তব হয়ে আবর্তিত হয়।

বাঙালির ধর্ম সাহিত্য মনসামঙ্গল কাব্য একটি জটিল সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব ও সমাজ স্বীকৃতির উপাখ্যান। চাঁদ মনসা দ্বন্দ্ব, বিরোধ এই সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্বের কেন্দ্রবিন্দু। এই বিরোধের অংশ হিসাবে কাব্যে যুক্ত হয়েছে ধনুস্তরী-মনসা উপকাহিনি। কাব্যে আমরা দেখি কীভাবে এক প্রান্তিক সমাজের অনার্য দেবী সংস্কৃতির মূল ধারায় প্রবেশ করতে চাইলে তাকে সহ্য করতে হয় প্রতিষ্ঠিত আর্থ ব্যবস্থার বিরোধিতা। মনসামঙ্গল কাব্যে মনসাকে লড়াই করতে হয়েছে একাধিক পুরুষ শক্তির সঙ্গে, বিশেষ করে দুই শক্তিমান চাঁদ ও ধনুস্তরীর সঙ্গে। সমাজের প্রান্তিক, অনার্য দেবী হিসাবে মনসার পরিচয়। এই প্রান্তিকতা থেকেই তার ক্রোধ, প্রতিহিংসাপরায়ণতা ও স্বীকৃতির জন্য লড়াই শুরু হয়। মনসার এই লড়াই যেন সমাজে প্রান্তিক মানুষদের আত্মপ্রতিষ্ঠা, আত্মপরিচয়ের লড়াই। চাঁদ সদাগর মনসাকে মেনে নিলে সমগ্র মর্ত পৃথিবী মনসাকে স্বীকার করবে, কিন্তু চাঁদ মনসার বশ্যতা স্বীকারে প্রত্যয়ী নয়, যা মনসার অহং-এ আঘাত করে। মনসা একে একে তার সকল পুত্রদের হত্যা করে এবং অন্যান্য কৌশলে তাঁদের জীবনকে বিপর্যস্ত করে তোলেন। চাঁদের চম্পকনগরের রক্ষাকর্তা ছিলেন মহা চিকিৎসক ধনুস্তরি। এখানেই শুরু হয় ধনুস্তরি-মনসা দ্বন্দ্ব। মনসা উপলব্ধি করেন যতদিন চম্পক নগরে ধনুস্তরী

জীবিত থাকবে, ততদিন চাঁদ তার অধীন হবে না এবং তার কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য সফল হবে না। ফলে সমাজে প্রতিষ্ঠার পথ হয়ে ওঠে আরও কষ্টকাকীর্ণ। মানুষ যখন স্বাভাবিকভাবে লড়াই করে জয়ী হয়ে ওঠে না, তখন তার মধ্যে রূপান্তর হয়ে ওঠে অবশ্যম্ভাবী। ধনস্তরির অলৌকিক ক্ষমতা, জ্ঞান ও প্রতিরোধ মনসার জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ালে মনসা এক পর্যায়ে নিজেকে নানা রূপে রূপান্তরিত করে কৌশলে ধনস্তরিকে হত্যা করতে প্রয়াসী হন। কেতকদাসের কাব্যে ধনস্তরির কাছে বিষ তৃণবৎ। ধনস্তরি বিষ মাখে, বিষ খায়, বিষধর নাগকে বালিশ করে শয়ন করে, এমন শক্তিমান পুরুষকে ও তাঁর শিষ্যদের হত্যা করতে তিনি কৌশলে নিজেকে মালিনী রূপে রূপান্তরিত করেন -

“শুনিএগ্ন সখীর বোল ভুজগ জননী। মায়া পাত্যা হৈলা দেবী ষোড়শী মালিনী।।

নানা পুষ্প তুলিল মালধঃ বাড়ী গিয়া। বিনিসুতে গাঁথে হার কালকূট দিয়া।।”^৬

বিজয় গুপ্তের কাব্যেও সঙ্কর গাড়রীকে হত্যা করতে মনসা মালিনীর রূপ ধারণ করেন-

“মালিনীর বেশ ধরি চলিলেন বিষহরি

বধিতে সএংকুর গাড়রি।”^৭

মালিনী রূপ ধরে ফুলের মধ্যে বিষ দিয়ে ধনস্তরির শিষ্যদের হত্যা করার পরেও তারা পুনরায় জীবিত হয়। মনসা ব্যর্থ হয়ে নেতার পরামর্শে ধনস্তরির শিষ্যদের মারতে গোয়ালিনী রূপে রূপান্তরিত হন। কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের কাব্যে মনসা বলেন-

“নেত বলে শুন দেবী ভুজগ জননী। আমার বচনে তুমি হঅ গোয়ালিনী।।

এতেক শুনিএগ্ন তবে ভুগজ জননী। মায়া পাত্যা মহামায়া হৈল গোয়ালিনী।।

ঝাড়িলে না পড়ে দধি উপরেতে সর। পসরা লইয়া যাব শঙ্খিনী নগর।।

ছয়কুড়ি ছয়ভাঙে সাজিয়া পসার। সহজে হইলা দেবী গোপিনী-আকার।।

সহজে হইলা দেবী গোয়ালিনী-বেশ। বেঢ় দিয়া অম্বর আঁটলা কটিদেশ।।”^৮

ধনস্তরি নিজেকে চিকিৎসা দ্বারা এবং তাঁর শিষ্যদের মনসার আক্রমণ থেকে বারবার রক্ষা করে। মনসা উপলব্ধি করে যে, স্বয়ং ধনস্তরিকে সমূলে ধ্বংস করতে তাঁর মৃত্যু পদ্ধতি জানা দরকার। আর সে কারণেই তিনি পুনরায় নিজেকে আবারও রূপান্তরিত করে। কেতকাদাসের কাব্যে মনসা কমলার সাথে ব্রাহ্মণীরূপ ধারণ করে সখীত্ব পাতিয়েছে। কবির বর্ণনায় -

সুবর্ণ কৌটায় করি : সুরঙ্গ সিন্দূর ভরি : সয়লা পাতাতে দেবী যান।।

যাইতে ওঝার বাড়ী : পরিলা পাটের শাড়ী : সুরঙ্গ সিন্দূর দিলা ভালে।।

যে কিছু বেভার নীত : মনে হয়্যা হরষিত : প্রবাল পূর্ণিত কৈলা গলে।।

বধিতে ওঝার প্রাণ : শঙ্খিনী নগরে যান : ঈশান-দুহিতা বিষহরি।

ধনস্তরি নাই দেশে : মনসা ব্রাহ্মণী বেশে : প্রবেশ করিলা তার পুরী।।...

মনসা কমলা দুঁহে পাতাইল সই। একাসনে বসিয়া ত দুঁহে কথা কই।।

কপট চাতুরী করে জয় বিষহরি। যেনমতে মরিবেক ওঝা ধনস্তরি।।”^৯

বিজয় গুপ্তের কাব্যে ধনস্তরিকে হত্যা করার পদ্ধতি জানতে মনসা যতিরূপ ধরে পৃথিবীতে আসেন এবং ধনস্তরির পত্নী কমলার মাসি রূপে নিজেকে রূপান্তরিত করেন। অন্যদিকে জগজ্জীবনের কাব্যে মনসা কমলার বোনের রূপ ধারণ করে ধনস্তরির মৃত্যুর রহস্য উন্মোচনে উদ্যত হয়েছে। তন্ত্রবিভূতির কাব্যেও একই বর্ণনা আছে। এই কবির কাব্যে মনসা ধনস্তরিকে মারতে নিজের গোয়ালিনী রূপ পরিত্যাগ করে বোনের রূপে পরিবর্তিত হয়-

কি করিব কি হইবে ভাবে মনে মন।

ধনস্তরি রোঝা আমি বোধিব কেমন।।

বিষাদেত বিষহরি নানা বুদ্ধি করে।

ধনস্তরির ভার্যার বোহিনী রূপ ধরে।।”^{১০}

মনসা ধ্বস্তুরি বাড়িতে গিয়ে কমলার মাসি, কমলার সখী, কমলার বোন রূপ ধারণ করে কৌশলে ধ্বস্তুরির মৃত্যুর রহস্য জানতে চায়। কমলা মনসার কপটতা বুঝতে না পেরে ওঝার কাছে গিয়ে ধ্বস্তুরির মৃত্যুর রহস্য জানতে চাইলে তিনি উপলব্ধি করতে পারেন, এটি মনসার চক্রান্ত। ধ্বস্তুরির কাছে মনসার কপটতা, চালাকি, চক্রান্ত ধরা পড়লে মনসা নিজের রূপ পরিবর্তন করে শ্বেতমাছিতে রূপান্তরিত হয়। কেতকাদাস লিখছেন-

“কমলা কান্দিয়া পড়ে প্রভুর চরণে। আমারে কহিবে তব মরণ কেমনে।।

ধরিয়া প্রভুর পায় কান্দে সীমন্তিনী। মরন-জীবন কথা কহ দেখি শুনি।।...

আপন মরণ কথা কহিল আপনি। শ্বেতমাছি-রূপে শুনে বিষ বিনোদিনী।।”

মনসার শ্বেতমাছিতে রূপান্তরিত হওয়ার দৃষ্টান্ত বিজয় গুপ্তের কাব্যেও পাওয়া যায়। মনসামঙ্গল কাব্যে মনসার দেবী থেকে মানবীতে, মানব থেকে ক্ষুদ্র প্রাণি শ্বেতমাছিতে রূপান্তর পাঠককে আখ্যান জটিলতার আবর্তে নিক্ষেপ করে। কিন্তু পাঠক লৌকিক বিশ্বাস ও চেতনার আলোকে মনসার এই রূপান্তরকে সহজ স্বাভাবিক হিসাবেই গ্রহণ করে। মনসার শ্বেতমাছিতে রূপান্তর আসলে একটি গভীর প্রতীকী তাৎপর্য ও দার্শনিক অর্থবহ হয়ে ওঠে। সাদা রং প্রায়শই শুদ্ধতা ও আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে যুক্ত হলেও সাদা রঙ কখনো কখনো শূন্যতা বা অনুভূতিহীনতারও প্রতীক। মনসা জন্ম মুহূর্ত থেকে অবহেলিত, বঞ্চিত। মনসা সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এমন এক অবস্থানে পৌঁছেছে, যেখানে তার অস্তিত্বই অন্যের কাছে অদৃশ্য। অন্যদিকে মাছি মৃত্যু ও পচনের সাথে সম্পর্কযুক্ত। মাছি পচনশীল বস্তুর আশেপাশে ঘোরে, যা মৃত্যু বা ক্ষয়ের প্রতীক। এছাড়াও ‘Taboo’ অনুযায়ী সাপ ও মাছি উভয়ই সমাজে ভীতির জন্ম দেয়। ক্ষুদ্রতা ও তুচ্ছতা অর্থেও মাছি শব্দটির ব্যবহার হয়। কোন মানুষের শ্বেতমাছিতে রূপান্তর আদতে তার সামাজিক মূল্যহীনতা, অস্তিত্বের সংকটকে নির্দেশ করে। মনসামঙ্গল কাব্যে সমাজে প্রতিষ্ঠার স্তরে মনসা উপেক্ষিত। মনসা জন্মের পরেই বিমাতার দ্বারা নিপীড়িত, যৌবনে বিয়ের পর স্বামী কর্তৃক অবহেলিত। মর্ত্য পৃথিবীতেও সমাজের উঁচু-নিচু সকল স্তরের মানুষের কাছে অবজ্ঞার পাত্রী হয়ে উঠেছে। এই বঞ্চিত, অবহেলিত, নিপীড়িত মনসা নিজের শক্তিবলে চম্পকনগরের সকল শ্রেণির মানুষের কাছে ভয়ের প্রতীক হয়ে উঠেছে। চম্পকনগরে মনসার হাত ধরেই মৃত্যু মিছিল সৃষ্টি হয়েছিল। মনসার এই শ্বেতমাছি রূপান্তর তাই একদিকে তার অস্তিত্বের সংকটের ছবিকে যেমন তুলে আনে, অন্যদিকে সে অপার ক্ষমতা বলে চম্পকনগরে মানুষের মৃত্যু ভয়ের প্রতীকী তাৎপর্য বহন করে। মনসার এই দেবত্ব থেকে মানবত্ব এবং মানুষ থেকে মাছিতে রূপান্তর মনসামঙ্গল কাব্যে একটি গভীর বৈপরীত্য বা প্যারাডক্স (Paradox) নির্মাণ করে। অলৌকিকতা যখন আর অলৌকিক নয়, তখন তা আসলে কী? এর উত্তরে বলা যায়, এ হল আখ্যান নির্মাণের এক বিশিষ্ট প্যারাডক্স। এ কারণেই পাঠক যুক্তি দিয়ে নির্মিত বুননের ভেতরে অব্যাক্ষেপে রহস্যকে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। বাঙালির ঐতিহ্যিক সমাজের কাছে মনসার রূপান্তর তাই বিশ্বাসযোগ্য বাস্তবতার অংশ হয়ে যায়।

মনসামঙ্গল কাব্যের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত রূপান্তরের অজস্র দৃষ্টান্ত আছে। মনসার মূল দ্বন্দ্ব চাঁদের সঙ্গে। দেবসভা থেকে বিতাড়িত মনসার প্রতিষ্ঠা নির্ভর করছে চম্পকনগরের শ্রেষ্ঠ বণিককুলের অধিপতি চাঁদের উপর। চাঁদের স্বীকৃতি পেতে মনসাকে সমাজের নানা স্তরের মানুষের সাথে লড়াই করতে হয়েছে। সমাজে প্রতিষ্ঠা পেতে নানা ছলনার আশ্রয় নিতে হয় মনসাকে। অনার্য শ্রেণির প্রতিনিধি মনসা নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে তার রূঢ়তা, কঠোরতা প্রকাশ পেয়েছে। চাঁদ ছিলেন শিবভক্ত, বর্ণাশ্রম ধর্মের অনুগামী ও নারীর দেবীভাবকে তাচ্ছিল্য করা এক কঠোর ব্রাহ্মণ্যবোধসম্পন্ন চরিত্র। অন্যদিকে মনসা ছিলো সমাজের এক প্রান্তিক নারীদেবী, লোকবিশ্বাসে গড়ে ওঠা এই প্রলেতাড়িয়েত শ্রেণি— যারা সমাজের মূল ধারায় ঠাই পায়নি। চাঁদের মনসা পূজা অস্বীকার এবং তাচ্ছিল্য মনসাকে প্রতিশোধ পরায়ণ করে তোলে। এই প্রতিশোধমূলক মানসিকতা থেকেই সে অত্যন্ত রুঢ় ও কঠোর হয়ে যান। মনসা চাঁদের মহাজ্ঞান হরণ, নাখরা বন ধ্বংস, ছয় পুত্র নাশ করে। চাঁদের এই দুর্দশা আরও কঠিন আকার ধারণ করে তার বাণিজ্য যাত্রার সময়। চাঁদের বাণিজ্য যাত্রা হয়ে ওঠে মনসার প্রতিহিংসা পরায়ণতার প্রতীকময় ক্ষেত্র। চাঁদের বাণিজ্য যাত্রায় মনসা তাঁকে একের পর এক অলৌকিকভাবে দণ্ড দেন। মনসার প্রথম দণ্ড আছে প্রকৃতির বিপর্যয়ের মাধ্যমে। মনসা তাঁর অতিপ্রাকৃত শক্তির সাহায্যে ঝড়-বৃষ্টি, বজ্রপাত, সমুদ্রের ঢেউয়ের দাপটে জাহাজ ডুবিয়ে দেন। চাঁদ সমস্ত পণ্য হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়ে। প্রকৃতিকে

তিনি হাতিয়ার হিসেবে এক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন। চাঁদের দুর্দশাকে ফুটিয়ে তুলতে লেখকরা জাদুবাস্তবতার লেখকদের মতোই এখানে প্যারাডক্স নির্মাণে রূপান্তরের অতি সুন্দর ব্যবহার করেছেন। মনসা কখনো কাক হয়ে, কখনো বাঘ রূপ ধারণ করে, আবার কখনো গাভী হয়ে চাঁদের অহংকার ভেঙে চূর্ণ করে। বাণিজ্যে সবকিছু হারিয়ে ক্রমাগত সাত দিন উপবাসী অবস্থায় জলে ভেসে ঘাটে উপস্থিত হয় চাঁদ। মনসা নিজের স্বার্থ রক্ষার্থেই দেবীত্ব পরিত্যাগ করে ব্রাহ্মণীর রূপ ধারণ করেন-

“ঘাটেতে উঠিয়া চান্দো মাথা কৈল হেট।
 পানি খাইএগা হইল তার হাঁড়ি হেন পেট।।
 ব্রাহ্মণী মুরতি পদ্মা হৈল সেই ঠাই।
 কি কারণে এত দুঃখ বানিএগা গোসাঞি।।”^{২২}

শুধু তাই নয়, সে চাঁদকে রান্নার সমস্ত উপকরণ নিয়ে এসে ঘাটে রান্না করার প্রস্তাব দেন। চাঁদ সদাগর সমস্ত উপকরণ সংগ্রহ করে রান্না করলে ব্রাহ্মণী রূপধারী মনসা আবার কাক রূপ ধারণ করে খাওয়ার পাতায় বিষ্ঠা ত্যাগ করে। মনসার এই বৈষম্যমূলক আচরণ পাঠককে বিস্মিত করে-

“রন্ধন করিলা সাধু ঘাটের উপর।।
 রন্ধন করিয়া সাধু বিছাইল পাত।
 কাগরূপে পদ্মাবতী বর্জিলেক তাত।।”^{২৩}

এই রূপান্তর পদ্ধতিকে তন্ত্রবিভূতিও অনুরূপভাবে উপস্থাপন করেছেন-

“যাক্দিয়া বনের শাক বাঢ়িলেন পাতে।
 কাকরূপে মনসা বর্জিয়া দিল তাতে।।”^{২৪}

জগজ্জীবনের মনসামঙ্গল কাব্যে ক্ষুধার্ত চাঁদ নিজের প্রাণরক্ষার তাগিদে শ্রীগলার হাতে গিয়ে চার পণ কড়ির বিনিময়ে কুম্ভকারের ভার বহনে সম্মতি প্রদান করে। এই কড়ি দিয়ে কিছু খাদ্যদ্রব্য কিনে তিনি প্রাণ রক্ষা করতে চেয়েছেন। এখানেও চাঁদকে চূড়ান্ত অপমান ও লাঞ্ছিত করতে বাঘরূপে আবির্ভূত হন মনসা। বাঘের বিক্রম দেখে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে সমস্ত ভার ফেলে দেয় চাঁদ। একারণে কুম্ভকার মজুরি সমেত তাঁর ধুতি কেড়ে নিলে সে দিগম্বর হয়ে। তবে তন্ত্রবিভূতির কাব্যে মনসার এই বাঘরূপ চাঁদ দেখতে পেলেও কুম্ভকার পান না। এক্ষেত্রে লেখক রূপান্তরের সাথে প্রতীককে ব্যবহার করেছেন। মনসা বাঘের বিকট মূর্তি ধরে তীব্র গর্জন করতে থাকে-

“তখন মনসা দেবী কোন কৰ্ম করে।
 বিকট মূর্তি হয় দেবী ব্যাঘ্ররূপ ধরে।।
 ব্যাঘ্ররূপ হএগা দেবী বনের ভিতর।
 গোজ্জিতে লাগিলা দেবী বানিয়া বরাবর।।
 ব্যাঘ্র দেখি বানিয়া হইলা চমৎকার।
 পড়িল হাড়ির ভার হৈএগা চুরমার।।
 কুম্ভার না দেখে ব্যাঘ্র ভাগ্যা গেল হাঁড়ি।
 চান্দোর মস্তকে মারে পজারের বাড়ি।।
 কাঢ়িয়া লইল কড়ি কুম্ভার কুমতি।
 হাঁড়ির বদলে নিল পরিধান ধুতি।।”^{২৫}

চাঁদ মনসার ছলনায় সমস্ত কিছুর হারিয়ে যখন কলার বাকল পরিধান করে লজ্জা নিবারণ করতে চেয়েছেন, তখন মনসা গাভী রূপ ধারণ করে সেটিও হরণ করে নিয়েছে। কবি বিজয় গুপ্তের কাব্যে-

“তার পড়ে চান্দো কলার বাকল পাইল।
 গাভীরূপে মনসা তাহা হরি নিল।।”^{২৬}

মনসার নির্দেশে নাগগণ, কাক, শকুনে রূপান্তরিত হয়েছেন এবং নেতাও বারবার মনসার নির্দেশে নিজের রূপের পরিবর্তন করেছে। নেতা সকুন রূপ ধারণ করে কার্য সিদ্ধি করতে না পারলে তক্ষনাৎ শকুন থেকে মানুষের রূপে রূপান্তরিত হয়েছে-

“পদ্যা বোলে সুন নেতা আমার উত্তর।
কাক সকুন রূপে জাও বেউলার গোচর।।
মড়া মাংস ভিক্ষা কর বিপুলার স্থানে।
আইজ বুঝি বিপুলার কিবা আছে মনে।।
কাক সকুন হউক যত সব নাগে।
গিধিনিরূপ ধরি তুমি জাইও আগে।।
জেহি মতে অঙ্গিকার পদ্যাবতি কৈল।
সেহি মতে নেতাদেবি সকুনরূপ হইল।।...
“ধর্মের দোহাই সুনি গেল চলিয়া।
আগুবাকে রইল গীয়া শ্রীকালরূপ হইয়া।।”^{২০}

এতকিছু করার পরেও সফল না হলে নেতা পদ্মার আদেশে পুনরায় বাঘরূপে পরিবর্তিত হয়েছে। উদ্দেশ্য একটাই বেহুলাকে ভয় দেখানো।

“জেমতে পদ্যাবতি অঙ্গিকার কৈল।
সেহি মতে নেতাবতি বাঘরূপ হইল।।”^{২১}

বেহুলার কঠিন যাত্রায় দেবী মনসা নিজেই কখনো বেহুলার সাহস ও সতীত্বের পরীক্ষা নিয়েছে আবার কখনো তার প্রতি সহায় হয়েছে। মনসার এই দৈত্য ভূমিকা আসলে একাধারে প্রতিশোধপরায়ণতা অন্যদিকে আশ্রয় দান। মনসার কাক ও কুমিরে রূপান্তরিত হয়ে বেহুলাকে রক্ষা করার মাধ্যমে আদতে এক সহায় সম্বলহীন নারীর প্রতি আর এক বঞ্চিত রমণীর সহানুভূতির প্রতীকী রূপ ধরা পড়ে।

মনসামঙ্গল কাব্যের প্রায় প্রত্যেক কবির রচনায় রূপান্তরের এমন বহু প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। কাব্যে শুধুমাত্র মনসা, নেতা চরিত্রেরই রূপান্তর নয়; শিব, চণ্ডী, নারদ এমনকি নাগগণ ও বিভিন্ন অপ্রাণিবাচক বস্তুরও অদ্ভুত রূপান্তর জাদুবাস্তবতার রূপান্তর পদ্ধতিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। জগজ্জীবনের মনসামঙ্গল কাব্যে শিব গৌরীকে বিয়ে উপলক্ষ্যে এক অদ্ভুত রূপ ধারণ করে। তাঁর পরনে বাঘছাল, সেই বাঘছাল সাপ দিয়ে বাঁধা, গলায় হাড়ের মালা, পুরো শরীরে ছাই ভস্ম মাখা, মাথায় পিঙ্গল জটা ভার নিয়ে একবৃদ্ধ রূপে হিমালয় গৃহে উপস্থিত হয়। হিমালয় পত্নী মেনকা এরূপ বৃদ্ধকে জামাই বলে স্বীকার করতে চায় না। মেনকা ও এয়োগণ জামাতা শিবকে বরণ করতে গেলে ঈশ্বর মূলের গন্ধে সকল সাপ অন্তর্হিত হয়। ফলে শিব উলঙ্গ হয়ে যায়। শিবের দিগম্বর রূপ দেখে এয়োগণ ও মেনকা ভয় পেয়ে পালিয়ে যায়। সকলে শিবকে পরিহাস করলে নারদের নির্দেশে নিমিষে তার রূপের পরিবর্তন ঘটে। শিবের এই রূপের রূপান্তর সম্ভব হয়েছে তার পরনের বিভিন্ন বস্তুর রূপান্তরের মাধ্যমে – এ যেন রূপান্তরের মধ্যে রূপান্তর।

দেখিতে আইল লোক কেমন গৌরীর বর।
পলাইয়া গেল সবে প্রাণে পায়া ডর।।
হেন রূপ ধর মামা কামিনীমোহন।
তুমার রূপ দেখি যেন ভুলে ত্রিভুবন।।
নারদের বচনে হর ধরেন সুবেশ।
মাথায় জটার ভার কুটিল করে বেশ।।
জটের উপর বিবর্জিত যত নাগ।
মাথার মটুক দিল মণিরাজ সাপ।।
কপালের উপর চন্দ্রমা করে জ্যোতি।

গলায়ে হাড়ের মালা হৈল গজমতি ।।
 অঙ্গের ভঙ্গ হৈল কস্তুরি চন্দন ।
 ব্যাঘ্রছাল অম্বর করিল পরিধান ।।
 বিপরীত রূপে শিবের হইল অলঙ্কার ।
 দেখিয়া শিবের রূপ হেমন্ত চমৎকার ।।”^{২৫}

মনসামঙ্গল কাব্যে চরিত্র ও বস্তুর এরূপ রূপান্তর পাঠককে জাদুবাস্তবতার এক অনন্য জগতে বিচরণ করায়। এমন পরিবর্তনই মনসামঙ্গল কাব্যগুলিকে জাদুবাস্তবতার সাহিত্য হিসাবে পরিচিতি দান করে। শিবঘরণী দুর্গার মধ্যেও রূপান্তর লক্ষ্য করা যায়। তন্ত্রবিভূতির কাব্যে দেবী দুর্গার মধ্যে এমনি এক রূপান্তর প্রত্যক্ষ করা যায়। শিব প্রত্যহ অন্য নারী সঙ্গোগ করে গৃহে ফেরে। তাঁর এই আচরণে দুর্গা যেমন মর্মান্বিত, ব্যথিত, তেমনি রাগান্বিতও। ফুলের সাজিতে করে মনসাকে নিয়ে বাড়ি এলে দুর্গার ক্রোধ শতগুণ বৃদ্ধি পায়। দুর্গা সাধারণ রমণী থেকে দশভুজা রূপ ধারণ করে।

“দুই হস্ত ছিল দুর্গার চারি হস্ত হইল ।।
 ক্রোধ হৈএগা তখন দুর্গা ধরিবারে জায় ।
 বায়ুবেগে শিবের সাজি দূরেত পালায় ।।
 চারি ভুজে শিবের সাজি নাগ নাহি পাইল ।
 চারিভুজা ছিল দুর্গা দশভুজা হৈল ।।”^{২৬}

শিব কামুক চরিত্র। নটিনী, কুচনি, ডোমনি সকল শ্রেণির নারীর প্রতি তার ভোগলিপ্সা। জগজ্জীবনের বর্ণনানুযায়ী এক বৎসর যাবত শিব মালধেও অন্য নারীর সংসর্গে থাকলে দুর্গা নিজের রূপ পরিবর্তন করে কখনো গোয়ালিনী রূপে, কখনো কুচনির রূপ ধরে শিবকে ছলনা করেন-

“গঙ্গার বচন শুনি দেবী পার্বতী ।
 সেইক্ষণে ধরিল দেবী কুচুনীমূর্তি ।।”^{২৭}

তবে বিজয় গুপ্তের কাব্যে দেবী চণ্ডী ডোমনির বেশ ধারণ করে শিবকে ছলনা করেছে -

সাত পাচ ভাবে চণ্ডী বলে মনের কোপে ।
 মাএগা করি ধরিব তোমা ডোমনির রূপে ।।”^{২৮}

জাদুবাস্তবতার আখ্যান কৌশলে পাঠকের মধ্যে রূপান্তরের প্রভাকে তীব্র করে তোলে এবং বাস্তব জীবনের সংঘাত ও সমস্যাগুলোকে আত্মস্থ করার একটি মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়। মনসামঙ্গল কাব্যে শিবের সঙ্গে দুর্গা বা চণ্ডীর বিরোধের মূল কারণ সংসারের দারিদ্র্য ও শিবে চারিত্রিক হীনতা। শিব-দুর্গার আড়ালে কবিরা তৎকালীন সমাজের বাস্তব ছবিকেই তুলে ধরেছেন। শিবের পরনারী গমন সমাজের এক গভীর সংকট ও উদ্বেগের সৃষ্টি করে। দুর্গার গোয়ালিনী রূপ, কুচনি রূপ, ডোমনি রূপ ধারণ করে শিবের সঙ্গে যৌনতায় লিপ্ত হয়ে আসলে একজন নারীর স্বামীকে যেনতেন প্রকারে ধরে রাখার মানসিকতা প্রকাশ পায়। তেমনি অন্যদিকে পুরুষের বহু নারী ভোগের যে আকাঙ্ক্ষা, সেই পুরুষতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে নারীর সংগ্রামকে তুলে ধরে। জাদু বাস্তবতার রূপান্তর পদ্ধতি এমন এক আখ্যান কৌশল, যাতে নারীদের জীবনের গল্পকে তুলে ধরা হয়েছে। তাদের পুরুষতান্ত্রিক সমাজের আধিপত্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে চেয়েছে। সম্ভব কারণেই Steven F. Walker বলেছেন -

“In magical realist terms, metamorphosis is an common an event as racist stereotyping is in terms of traditional social realism.”^{২৯}

নারায়ণ দেবের কাব্যে দেবী চণ্ডীর এমন মুহূর্ত রূপ পরিবর্তনের চিত্র বর্ণিত হয়েছে সাহে রাজা ও চাঁদের যুদ্ধ বর্ণনার প্রসঙ্গে। বেহুলার পিতা সাহে রাজা ও লখিন্দরের পিতা চাঁদ সদাগরের মধ্যে যুদ্ধের কাহিনি বর্ণনা নারায়ণ দেবের কাব্য ব্যতীত অন্য কোনো কবির কাব্যে পাওয়া যায় না। চাঁদ সদাগর লখিন্দরের বিয়ে উপলক্ষ্যে সেনায় সজ্জিত হাতি, ঘোরা নিয়ে জয়ঢাক বাজিয়ে উজানি নগরের দিকে অগ্রসর হলে প্রজারা ভয় পেয়ে সাহে রাজার কাছে অমঙ্গলের আশংকা প্রকাশ

করে। সাহে রাজা ছয় পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে গঙ্গা পার হয়ে চাঁদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাত্রা করলেন। সাহে রাজা ও চাঁদের এই যুদ্ধে চাঁদের সাহায্যকারী হিসাবে স্বয়ং দেবী চণ্ডী যুদ্ধক্ষেত্রে আবির্ভূত হন। যুদ্ধে দেবী চণ্ডীর রূপের পরিবর্তন আমাদের জাদুবাস্তবতার সাহিত্যের আঙ্গিনায় নিয়ে যায়-

“দুই দলে রণ বাজাইয়া চণ্ডী আই।
 মৈধ্যে রহিয়া রুধির পরম সুখে খাই।।
 চামুণ্ডা মূর্তি ধরে দেবি দেখিতে ভয়ঙ্কর।
 সংহারিণী রূপে দেবী করয়ে সংহার।।
 নানারূপ ধরে দেবী কাক সকুনি হইয়া।
 সোস্তোসে পারোণা করে রক্ত মাংস খাইয়া।।
 চমৎকার সন্দে দেবি গিলিলত রোসে।
 চিল রূপে মুণ্ড লয়া উঠিল আকাশে।।”^{১০}

দেবী চণ্ডীর রূপান্তরের মাধ্যমে নারায়ণ দেবের কাব্যে জাদুবাস্তবতার একটি সম্মোহনী পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। জাদুবাস্তবতার উপন্যাস ও ছোটোগল্পে রূপান্তর প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয় ক্রমান্বয়িকভাবে। মনসামঙ্গল কাব্যগুলিতে রূপান্তর হয়েছে অকস্মাৎ। এক্ষেত্রে অলৌকিক, দৈবিক ক্ষমতা ও লৌকিক ঐতিহ্যের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। মনসার চক্রান্তে বানিজ্য যাত্রায় চাঁদ ধন, জন, সম্পদ হারিয়ে নিঃস্ব হয়। দীর্ঘ সাত দিন অল্পহীন অবস্থায় অতিবাহিত হয়। সে ক্ষুধার জ্বালা মেটাতে বনের মধ্যে কিছু খাদ্যের অন্বেষণ করলে কাঁঠালের সন্ধান পান। দীর্ঘদিন ক্ষুধার্ত মানুষের কাছে এই কাঁঠাল কতটা প্রাণদায়ী, তা একজন ক্ষুধার্ত মানুষই উপলব্ধি করতে পারে। মনসার মায়ায় সেই কাঁঠাল অকস্মাৎ ভিমরুলের বাসায় রূপান্তরিত হয়। কবি বিজয় গুপ্তের লেখনীতে

“বনের মধ্যে চান্দো পাকা কাঁঠাল পায়ে।।
 কাঁঠাল পাইয়া চান্দো মনে করে আশা।
 মনসার কপটে হইল ভিঙ্গুলের বাসা।।
 শিব পূজা করি চান্দো কাঁঠাল খাইতে চায়।
 নাকে মুখে চৌক্ষে তারে ভিঙ্গুলে কামড়ায়।।”^{১১}

রূপান্তরের দৃশ্যটি পাঠককে ‘থ্রি ডাইমেনসনিক’ বাস্তবতার জগতে পৌঁছে দেয়। চাঁদ যাকে কাঁঠাল ভাবে, তা কাঁঠাল নয়; আবার মনসা যাকে ভিমরুলের বাসায় পরিণত করেছে, তা ভিমরুলের বাসা নয়। কাঁঠাল ও ভিমরুলের বাসার উপস্থিত বাস্তবতাকে (Present Reality) ছাপিয়ে সত্য হয়ে উঠেছে আরেক বাস্তবতা- এ হল প্রকৃত বাস্তবতা (Real Reality)। আসলে ক্ষুধার জ্বালায় চাঁদ এতটাই বিকল যে, সে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েন। এমতাবস্থায় তিনি কোনো মৌমাছির চাক থেকে মধু সংগ্রহ করে তাঁর ক্ষুধা নিবারণ করতে চেয়েছে। জাদুবাস্তবতায় রূপান্তরের এই প্রক্রিয়াটি আসলে চাঁদের ক্ষুধার জ্বালায় জর্জর হয়ে যাওয়ার প্রতীকী অথচ গভীর বাস্তবতাকে প্রকাশ করেছে। অপ্রাণিবাচক বস্তুর রূপান্তরের আর একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত আছে নারায়ণ দেবের কাব্যে। এই কাব্যে আমরা দেখি, চাঁদ মনসার চক্রান্তে সাত দিন জলে ভেসে লক্ষ্মীপুর নগরে উপনীত হয়। এই নগরের অধিপতি চন্দ্রধর মণ্ডলের সাথে মিত্রতা স্থাপন করে। চন্দ্রধর চাঁদকে অন্ন, বস্ত্র দিয়ে তাঁর প্রাণ রক্ষায় ব্রতী হয়। কিন্তু ‘অভাগা যদ্যপি চায় সাগর শুকায়ে যায়’। চন্দ্রধরের শিশুপুত্রকে চাঁদ কোলে নিয়ে পরনের অলংকারের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেই বহুমূল্যবান রত্ন অঙ্গারে রূপান্তরিত হয় -

“নও লক্ষের হাড় ছড়া সুভিয়াছে গলে।
 রত্নের হাড় চান্দো লাগে চাহিবার।।
 পদ্যার কপটে হাড় হইল য়াঙ্গর।।”^{১২}

তন্ত্রবিভূতির কাব্যেও কর্ষণযুক্ত জমি অঙ্গারে পরিবর্তিত হয়েছে। এই কাব্যে চাঁদপুত্র হলধরের সাথে মনসার দ্বন্দ্ব জমির অধিকারকে কেন্দ্র করে। মনসা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণীরূপে রূপান্তরিত হয়ে হলধরের জমি জবরদখল করতে চায়। হলধর তাঁকে

জমি থেকে উচ্ছেদ করতেই সে অভিশাপ দিয়ে জমিকে অঙ্গরে পরিণত করেছে। জাদুবাস্তবতার মেটাফিকশন রীতিতে অভিশাপ ব্যবহার করে লেখকরা আখ্যানকে বাস্তব থেকে অবাস্তবে নিয়ে যান, তবে সেই অবাস্তবের অন্তরালে চূড়ান্ত বাস্তবতা বিরাজমান। কবি তন্ত্রবিভূতির বর্ণনায়-

“কৃষিকগণ কৃষি করে দাড়াএগা কুমার।
 দেবী পদ্মাবতী গেল মায়া পাতিবার।।
 বৃদ্ধ ব্রাহ্মণী দেবী এ রূপ ধরিএগা।
 কুমারের আগে দেবী মিলিল আসিএগা।।
 তুমি ছাড়িএগা দেহ ই ভূমি আমার।
 দেবী বোলে তোর ভূমি হউক অঙ্গর।।
 দেবতী পদ্মাএ জদি এতেক বোলিল।
 সকল ভূমিতে ভূষ অঙ্গর হইল।।”^{৩০}

অলৌকিকতা, লোকবিশ্বাস রূপান্তরের এই ধারনাকে গতিশীলতা দান করে। রত্নের ও রত্নের মতোই বহুমূল্যবান ভূমির অঙ্গরে পরিণত হওয়ার মাধ্যমে চাঁদের সৌভাগ্য কলঙ্কিত হয়ে যাওয়ার ঘটনাকেই প্রতীকের আড়ালে ব্যঞ্জিত করেছে। অপ্রাণিবাচক বস্তুর এমন রূপান্তর কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের কাব্যে ‘হাসান-হোসেন’ পালায় লক্ষ করা যায়। তৎকালীন সময়ের ঐতিহাসিক বাস্তবতাকে প্রকাশ করতে কবি গন্ধরাজ ফুলকে ভিমরুলে এবং তুলসী গাছকে আলকুশিতে পরিবর্তন করেছেন। হাসন-হোসেনের সঙ্গে মনসার বিরোধ সেই সময়ের হিন্দু মুসলিম বিরোধের ছবিকেই তুলে ধরে। মনসা হাসন-হোসেনকে শাস্তি দিতে প্রকৃতিকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছেন। ভিমরুল, আলকুশি তাঁর অস্ত্র স্বরূপ। রূপান্তরের এই বিষয়টিকে চমৎকার ভাবে উপস্থাপন করেছেন কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ। যেমন -

“যতেক যবন : করি সংহারণ : আমার যুকতি ধর।।
 গন্ধরাজ ফুল : হউক ভূমুল : মনসা আদেশ কৈল।
 দেবীর আদেশে : চক্ষুর নিমিষে : অসংখ্য ভূমুল হৈল।।
 শ্রীরাম-তুলসী : হৈল আলকুশী : লাগিল ঠাটের গায়।”^{৩৪}

বললে অতু্যক্তি হয় না যে, রূপান্তরের এমন উজ্জ্বল উদাহরণ জাদুবাস্তবতার উপন্যাস ছোটগল্পকে ছাপিয়ে যায়। শিবের বিভিন্ন রূপ পরিবর্তন, দুর্গার ডোমনি, কুচনি রূপ, মনসার দেবী থেকে মানুষের রূপ গ্রহণ, মনসার কাকড়া, বাঘ, পতঙ্গ রূপ, নেতার কাকরূপ, শকুনরূপ, অপ্রাণিবাচক বস্তুর অন্য বস্তুতে রূপান্তরের নানা উদাহরণ মনসামঙ্গল কাব্যে রয়েছে। এই পর্বে রূপান্তর জাদুবাস্তবতার আখ্যানশৈলী একটি কৌশল হিসাবে কাজ করে- যা মানবিক বিপর্যয় কিংবা ব্যতিক্রমকে এক উন্নততর এবং বিশ্বাসযোগ্য দৃষ্টিভঙ্গিতে উপস্থাপন করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

Reference:

১. Rushdie, Salman, midnight’s children, London, picadar, 1982, p. 10
২. Rushdie, Salman, midnight’s children, London, picadar, 1982, p. 22
৩. Faris, Wendy B, ‘Scheherazade’s Children : Magical Realism and PostModern Fiction’. Magical Realism : Theory, History and Community, Ed. Lois Parkinson Zamora and Wendy B. Faris, Duke University Press, Durhan & London, 1995, p. 178
৪. ঘোষাল, জগজীবন, মনসামঙ্গল, শ্রী সুরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য ও ড. আশুতোষ দাস সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬০, পৃ. ১০৫
৫. ক্ষেমানন্দ, কেতকাদাস, মনসামঙ্গল, অক্ষয়কুমার কয়াল ও চিত্রাদেব সম্পাদিত, লেখাপড়া, প্রথম সংস্করণ, ১৩৮৪, পৃ. ৮৯-৯০
৬. তদেব, পৃ. ১৭৮

৭. গুপ্ত, বিজয়, পদ্মাপুরাণ, শ্রী জয়ন্তকুমার দাশগুপ্ত সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পুনর্মুদ্রণ, ২০০৯, পৃ. ১৭২
৮. ক্ষেমানন্দ, কেতকাদাস, মনসামঙ্গল, অক্ষয়কুমার কয়াল ও চিত্রাদেব সম্পাদিত, লেখাপড়া, প্রথম সংস্করণ, ১৩৮৪, পৃ. ১৭৬-১৭৭
৯. তদেব, পৃ. ১৮১-১৮২
১০. তন্ত্রবিভূতি, মনসাপুরাণ, ড. আশুতোষ দাস সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮০, পৃ. ১১৬
১১. ক্ষেমানন্দ, কেতকাদাস, মনসামঙ্গল, অক্ষয়কুমার কয়াল ও চিত্রাদেব সম্পাদিত, লেখাপড়া, প্রথম সংস্করণ, ১৩৮৪, পৃ. ১৮৩
১২. ঘোষাল, জগজ্জীবন, মনসামঙ্গল, শ্রী সুরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য ও ড. আশুতোষ দাস সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬০, পৃ. ১৪৬
১৩. তদেব, পৃ. ১৪৬
১৪. তন্ত্রবিভূতি, মনসাপুরাণ, ড. আশুতোষ দাস সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮০, পৃ. ১৯৩
১৫. তদেব, পৃ. ১৯৯
১৬. গুপ্ত, বিজয়, পদ্মাপুরাণ, শ্রী জয়ন্তকুমার দাশগুপ্ত সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পুনর্মুদ্রণ, ২০০৯, পৃ. ২৯০
১৭. তন্ত্রবিভূতি, মনসাপুরাণ, ড. আশুতোষ দাস সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮০, পৃ. ১৯৯
১৮. তদেব, পৃ. ২০২
১৯. তদেব, পৃ. ২০৪
২০. ভট্টাচার্য, সুখেন্দু, মেটামরফোসিসের কাফকা ও গল্পকথা, পুনশ্চ, পি.ডি.এফ. পৃ. ১৫
২১. পিপিলাই, বিপ্রদাস, মনসাবিজয়, ড. সুকুমার সেন সম্পাদিত, এশিয়াটিক সোসাইটি, পৃ. ২০৮
২২. ঘোষাল, জগজ্জীবন, মনসামঙ্গল, শ্রী সুরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য ও ড. আশুতোষ দাস সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬০, পৃ. ২৭২
২৩. দেব, নারায়ণ, পদ্মাপুরাণ, শ্রীতমোনাশ চন্দ্র দাশগুপ্ত সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পুনর্মুদ্রণ, ২০১১, পৃ. ১১২
২৪. তদেব, পৃ. ১৩১
২৫. ঘোষাল, জগজ্জীবন, মনসামঙ্গল, শ্রী সুরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য ও ড. আশুতোষ দাস সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬০, পৃ. ৬২-৬৩
২৬. তন্ত্রবিভূতি, মনসাপুরাণ, ড. আশুতোষ দাস সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮০, পৃ. ১২
২৭. ঘোষাল, জগজ্জীবন, মনসামঙ্গল, শ্রী সুরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য ও ড. আশুতোষ দাস সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬০, পৃ. ৭৬
২৮. গুপ্ত, বিজয়, পদ্মাপুরাণ, শ্রী জয়ন্তকুমার দাশগুপ্ত সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পুনর্মুদ্রণ, ২০০৯, পৃ. ২৬
২৯. Walker, Steven F, 'Magical Archetypes : Midlife Miracles in The Satanic Verses', Theory, History and Community, Ed. Lois Parkinson Zamora and Wendy B. Faris, Duke University Press, Durhan & London, 1995, p. 351
৩০. দেব, নারায়ণ, পদ্মাপুরাণ, শ্রীতমোনাশ চন্দ্র দাশগুপ্ত সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পুনর্মুদ্রণ, ২০১১, পৃ. ২৯৯
৩১. গুপ্ত, বিজয়, পদ্মাপুরাণ, শ্রী জয়ন্তকুমার দাশগুপ্ত সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পুনর্মুদ্রণ, ২০০৯, পৃ. ২৯১
৩২. দেব, নারায়ণ, পদ্মাপুরাণ, শ্রীতমোনাশ চন্দ্র দাশগুপ্ত সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পুনর্মুদ্রণ, ২০১১, পৃ. ২৪৭
৩৩. তন্ত্রবিভূতি, মনসাপুরাণ, ড. আশুতোষ দাস সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮০, পৃ. ১২৭
৩৪. ক্ষেমানন্দ, কেতকাদাস, মনসামঙ্গল, অক্ষয়কুমার কয়াল ও চিত্রাদেব সম্পাদিত, লেখাপড়া, প্রথম সংস্করণ, ১৩৮৪, পৃ. ১১৪